টুসু সত্যাগ্রহ : একটি সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন

মৌমিতা বিশ্বাস

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক (SACT), ইতিহাস বিভাগ

নব বারাকপুর প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়, নিউ বারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১

রিসার্চ স্কলার, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খন্ড

সারসংক্ষেপ :

এই প্রবন্ধে "টুসু সত্যাগ্রহ" আন্দোলনকে একটি সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামের প্রতীক। টুসু গান, যা মূলত একটি কৃষিভিত্তিক উৎসবের অংশ, একসময় রাজনৈতিক প্রতিবাদের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। বিহারের মানভূম জেলায় বসবাসকারী বাংলাভাষী জনগণের ওপর হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির চাপিয়ে দেওয়া এবং বাংলা ভাষার ব্যবহারে সরকারি বিধিনিষেধ জারির প্রতিবাদে এই আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত টুসু গান রাজনৈতিক লোকসঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে চেতনা ছড়িয়ে দেয়। অরুণচন্দ্র ঘোষ, ভজহরি মাহাতো ও কাননবিহারী ঠাকুর প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে সংগঠিত এই আন্দোলন ছিল অহিংস, কিন্তু বিহার সরকার তা দমন করতে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করে। এই প্রবন্ধে টুসু গানগুলির ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা, আন্দোলনের ধরন, সরকারি নিপীড়ন এবং গণমানুষের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আন্দোলনের সফল পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো টুসু সত্যাগ্রহের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা এবং এটি কেবল ভাষার জন্য একটি আন্দোলন নয়, বরং আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম—এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

মূল শব্দ: টুসু গান, ভাষা আন্দোলন, মানভূম, সাংস্কৃতিক অধিকার, অহিংস সত্যাগ্রহ, বঙ্গভূক্তি আন্দোলন

ইতিহাস হল সমাজের দর্পণ, আর সংগীত সেই আয়না যেখানে প্রতিফলিত হয় সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের স্মৃতি। বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অনন্য ধারক টুসু গান, যা মূলত কৃষিনির্ভর সমাজের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনচেতনার প্রতিফলন। টুসু হল শষ্যের দেবী। এটি প্রধানত কৃষি কেন্দ্রিক সমাজের পৌষালি শষ্যের সুফলনের ও প্রাচুর্যের উৎসব। তবে শস্যদেবীর আরাধনা ঘিরে শুরু হলেও এটি ধীরে ধীরে গ্রামীণ নারীমনের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে এবং ভাষা ও সংস্কৃতি

Society Language Culture

রক্ষার আন্দোলনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। টুসু সত্যাগ্রহ কেবল একটি ভাষা আন্দোলন নয়, বরং আত্মপরিচয়, অধিকার ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের সংগ্রাম। সরকারি দমননীতি, গণমানুষের প্রতিক্রিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি এর ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো টুসু সত্যাগ্রহের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা এবং এটিকে কেবল ভাষার জন্য নয়, বরং আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করা।

বাংলার লোকসংস্কৃতি তার ইতিহাস, প্রতিবাদ ও সামাজিক বোধের এক বিশাল আধার। টুসু গান এই লোকসংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারক। এটি কেবল উৎসবের অনুষঙ্গ নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ভাষা। ডঃ সুধীর কুমার করণ টুসুকে 'জাতীয় লোকসঙ্গীত' বলে তাঁর 'পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধে অবিহিত করেছেন। টুসু গানগুলি সামাজিক ও গনমানুষের সংগ্রামি চেতনার সাক্ষর বহন করে। বহু টুসু সংগীতে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামি উপাদান ছড়িয়ে রয়ছে। সনৎকুমার মিত্রের মতে, টুসু সংগীত হল রাজনৈতিক লোকসংগীত, এঙ্গেলস যাকে Political folksong বলে অভিহিত করেছেন.[১]

টুসু গান ও ভাষা আন্দোলন বাংলার লোকসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক চেতনার সাথে গভীরভাবে জড়িত। বাংলার ইতিহাসে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক এক গভীর অন্তপ্রবাহের বহিঃপ্রকাশ। টুসু গান এই ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যন্ত্রণা আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ধরা দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র ভাষার অধিকার অর্জনের লরাইয়ের মাধ্যমই নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব ও গৌরব রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। টুসু গানের ছন্দ, সুর ও কথায় আমরা সেই ইতিহাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, যেখানে নারী, কৃষক, প্রান্তিক মানুষও প্রতিবাদে সামিল হয়ে ওঠে নিজের ভাষা ও কন্ঠের মাধ্যমে। তাই টুসু গান ও আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক শুধু সাংগীতিক নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন– যেখানে লোকসংস্কৃতি ইতিহাসের বাহক হয়ে ধরা দিয়েছে।

অনেক ইতিহাসই জনগনের লিখিত গ্রন্থে লিখিত থাকেনা, থাকে লোকসংস্কৃতির পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে। তেমনি টুসু গান গুলির মধ্যেও রয়েছে বহু সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস তথা গনমানুষের সংগ্রামী চেতনার বাহার, কিন্তু সংগ্রহের অভাবে আজতা কালের গর্ভে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখনও বহু টুসু সংগীত রয়েছে যার শরীরে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামী চেতনা ও উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। এমনই এক টুসুগান যার রচয়িতা পুরুলিয়ার রাধানাথ মাহাত।

সরকারেই পদ নিবেদন___
মোদের বাঁচার উপাই কি এখন?
আমরা হলাম পুরুল্যার সাধাসিধে জনগণ।
খরায়-জরায় জর্জরিত পরনে ছেঁড়া বসন।।

রাজ্য ভিতর জেলা মোদের কেন পিছে পড়ি রন?
কলকারখানা কেন না-কর জেলায় স্থাপন?
মোদের বাঁচাবার লক্ষ্য বল কেন নাই এখন?
আমরা কি বিরাল কুকুর আমরা কি ইতরজন!
যোগ্যতা দেখিয়া কাজ দিবে, দিবে কিনা দিবে ধন?
কোন পথে বলহ মোদের দারিদ্র হবে মোচন?
এক সাথে মিলিয়া সবে সাজাব আজ মহারণ।
ছিনিমিনি চইলবে না আর লইয়া মোদের জীবন।।[২]

টুসু সত্যাগ্রহ ভারতের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত স্বাধীনতা লাভের করলেও বাংলাভাষী পুরুলিয়া ছিল বিহার সরকারের মানভূম জেলার অন্তর্গত। সেখানে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল অধিকাংশ, কিন্তু তারা পশ্চিমা হিন্দী সংস্কৃতির প্রবল আগ্রাসনের মুখে নানাভাবে দলিত ও পিষ্ঠ হয়েছিল। ১৯৩১ এর আদমসুমারিতে দেখা যায়, মানভুম জেলার সদর মহকুমা পুরুলিয়ার শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ বাংলাভাষী। ১৯৩৫ সালে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গড়ে তোলা হয় 'মানভূম বিহারী সমিতি'। যার প্রতিবাদে ১৯৩৮ মানভূমে হিন্দির আগ্রাসন কে বন্ধ করার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতা ব্যরিস্টার প্রফুল্ল রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে গড়ে তোলা হয় মানভূম সমিতি বা বাঙালী সমিতি। এর লক্ষ্য ছিল মানভূমে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী যথা স্লেট, পেনসিল, বইপত্র সরবরাহ করা, কোন অর্থ ছারাই। সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মানভূম জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও বাংলাভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। Circular no. 701/5R-6-48-Dt.18th March,1948 এ বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন বাংলা হরফের সাইনবোর্ড টাঙানো যাবেনা, তা লিখতে হলে ভাষা হিসেবে দেবনগরী অর্থাৎ হিন্দি ব্যবহার করতে হবে। এমনকি স্কুল শুরুর প্রারম্ভে যে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হয়, তাতেও বাংলা গানের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'রামধুন' গাওয়ার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে জেলা স্কুল পরিদর্শকের থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারি অনুপ্রদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক বলা হয়। এমনকি প্রকাশ্যভাবে গ্রামে শহরে সরকারি মদতে হুমকি দেওয়া হত –'মানভূম বঙ্গাল মে নেহি যায়েঙ্গে, যানে পর খুন কে নদী বাহা দেঙ্গে'। ফলে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবী নিয়ে তৎকালীন মানভূম, সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানে আন্দোলন শুরু হয়। তখন লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাতো রাজনৈতিক ভাবযুক্ত কয়েকটি প্রতিবাদী টুসুগানে বাঁধেন, যা এখনও লোকজীবনে শোনা যায়। তার মধ্যে একটি হল নিম্নরুপ,

Society Language Culture

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলাভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা –বিহার বুদ্ধিটাই।.....[৩]

মানভুমের সাধারন মানুষ যাতে সরকারের সৃষ্ট বিভাজন নীতির ফলে ভুল পথে পরিচালিত না হয়ে সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে পারে সেই আহ্বান এখানে করা হয়েছে। টুসু গানের মাধ্যমে মৈত্রীর বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বাংলা ও বিহারের স্বার্থকে একে অপরের বিপরীতে দাড় করানো একেবারে অনুচিত। বাংলা ভাষার দাবীকে দমন করতে গিয়ে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাঙালী-বিহারী বিরোধকে উস্কে দিচ্ছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে বিহার সরকার যুক্তিসংগত ও ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছে, যা অন্যায়। এই গানটির মধ্যদিয়ে মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভেদকামি মনোভাবের প্রতি সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে।এসময় টুসুগানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ খ্রীঃ মানভুম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষ লোকসেবক সংঘের মাধ্যমে অভিনব টুসু সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষ "টুসুর গানে মানভূম" নামে বঙ্গভূক্তির প্রেক্ষিতে টুসু গানের ষোলো পৃষ্ঠার সংকলন পুস্তিকার প্রকাশ করেন। প্রাপ্তিস্থানের নাম ছিল- লোকসাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া।[৪]

বাংলাভাষার দমনে, হিন্দীভাষী কংগ্রেসিদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য তার টুসুগানে,

প্রাণে আর সহে না/হিন্দী কংগ্রেসিদের ছলনা।
ইংরাজ আমলে যারা গো/করতো মোসাহেবিয়ানা।
এখন তারা হিন্দী কংগ্রেসি/মানভূমে দেয় যাতনা।[৫]

ততকালীন বিহারের মানভূম জেলার কাননবিহারী ঠাকুর মনেপ্রাণে কংগ্রেসী হয়েও, হিন্দীভাষী কংগ্রেসীদের হীনতাপূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী হন। তাঁর লেখা টুসুগান নিম্নরূপ,

স্বাধীন জীবনে/এবার মিলব রে জনে জনে।।
সত্য পথে চল্ রে সবাই/গান্ধী-বাণী রাখ্ মনে।

কানন বলে পাবি আরাম/বাংলাভাষার জীবনে ।।[৬]

অরুণচন্দ্র ঘোষের টুসুগান পুরুলিয়ার বঙ্গভূমির সময় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

‘আমার বাংলাভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।
এই ভাষাতেই কাজ চলছে
সাত পুরুষের আমলে ।।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা ব’লে।।
এই ভাষাতেই পরচা রেকড
এই ভাষাতেই চেক-কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাত পুরুষের হক পাটা।।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষার চির অধিকার।
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার ।।[৭]

এই গানটির প্রথমদিকে বাংলা ভাষার অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হলেও, শেষের দিকে সাধারণ জনগনের প্রতি সতর্কতা জানানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দেশের সম্ভাব্য পরিণতির আশঙ্কাও করা হয়েছে। লক্ষনীয় যে, পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির প্রাক্কালে টুসুগান বাংলাভাষী অগণিত জনগণের আন্তরিক প্রিয়তায় গণসংগীত থেকে রাজনৈতিক সংগীত হিসাবে ভাষা-আন্দোলনের দুর্ধর্ষ হাতিয়ার হয়েছিল। ‘টুসুর গানে মানভূম’ সংকলনে ‘শুন বিহারী ভাই’ এবং ‘আমার বাংলাভাষা প্রানের ভাষারে’ গানদুটি গণসংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল। বিহারের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন সুকৌশলি ব্যবস্থা গ্রহন করে বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে হিন্দি ভাষার প্রতি আগ্রহী করার পশ্চাতে তিরিশ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রলোভন দেখানো হয়।

১৯৫০এর দশকের প্রথমার্ধে পুরুলিয়ার টুসু সত্যাগ্রহ ছিল এক শান্তিপূর্ন ও অহিংস আন্দোলন। সেটি মূলত ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের দাবীতেই সংঘঠিত হয়েছিল। তবুও বিহারের তৎকালীন সরকার এই মানবিক ন্যায়সংগত তথা গন্তান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য সহিংস কৌশলই অবলম্বন করেছিল। ১৯৫৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সুচেতা কৃপালনী, এন সি চ্যাটার্জী এবং লোকসভার আরো তিনজন সদস্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নিকট

Society Language Culture

অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। সরকারি দমননীতির অংশ হিসাবে বিহারের প্রশাসন টুসু গান পরিবেশনকারী পাঁচটি দলের ১৭জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিভূতিভূষন দাশগুপ্ত সম্পাদিত মুক্তি পত্রিকার ৮মার্চ, ১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে আরো পাঁচটি দলের ২৩জন সত্যাগ্রহীকে কারাদণ্ড দেওয়ার কথা জানা যায়। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভজহরি মাহাতো এক বছরের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানায় দন্ডিত হন। অরুনচন্দ্র ঘোষ এবং আরো চারজন টুসু সত্যাগ্রহী চোদ্দ মাসের জন্য সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

পুরুলিয়ার গ্রামবাসিদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চারের জন্য ১৯৫৪, ২রা মার্চ মানবাজার থানার পিটিদারি গ্রামের সত্যাগ্রহিদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, মহিলাদের ওপর অশোভন আচরন করে হবিবুল্লা নামে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনি। ১৯৫৪ খ্রীঃ ১১ মার্চ পুলিশ বাহিনী ২২৫০ কপি ‘টুসুর গানে মানভূম’ পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করে।৩ টুসু সত্যাগ্রহীদের ওপর নানাভাবে পুলিশি হয়রানি করা হয়। ১৯৫৪ খ্রীঃ ২৯ মার্চ এন.সি.চ্যাটার্জি লোকসভায় পুরুলিয়ার টুসু সত্যাগ্রহীদের ওপর থেকে দমন-পীড়ন নীতি প্রত্যাহার করে নেবার দাবী জানান।

১৯৫৫সালের ২০ডিসেম্বর এ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্তে সাংসদ চৈতন মাঝি তার মতামত উপস্থাপন করেন, যার প্রতিলিপি পরে ১৯৫৬ সালের ২রা জানুয়ারীতে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে , বিহারে ভূমিজ, দেশওয়ালি, মাঝি, কড়া, মুদি, মাহালি আদিবাসীরা একমাত্র বাংলাভাষাতেই কথা বলে এবং এখানে সাঁওতালরা একমাত্র আদিবাসীভাষাতে কথা বলেন এবং তার সাথে বাংলাকে তাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসেবে গহণ করেন। তার দেওয়া তথ্য অনুসারে বিহারে সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ, তাই এই অঞ্চলগুলি বাংলার সাথে যুক্ত হলে ১২ লক্ষ সাঁওতাল বাংলার সাড়ে ছয় লক্ষ সাঁওতালদের সাথে যুক্ত হতে পারবে। তবুও বিহার সরকার আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের সম্বন্ধ বিহারের সঙ্গে বলে দাবী করলেও, চৈতন মাঝি সেই যুক্তিকে ভিত্তিহীন বলেই প্রমান করেন এবং তাদের সামাজিক সম্বন্ধ পশ্চিমবঙ্গের সাথে অধিক বলেই জানান।

বিহারে কংগ্রেসি সরকারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সারা পুরুলিয়ায় ১৯৫৬ সালের ২১জানুয়ারী বনধ পালিত হয়। ১৯৫৬,২০এপ্রিল লোকসেবক সংঘের অতুলচন্দ্র ঘোষ ও তার সহধর্মিণী লাবন্যপ্রভা দেবীর নেত্রিত্বে একহাজার পাঁচজন নরনারী পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় পদযাত্রা করে অভিযান শুরু করেন এবং মাদল,খোল,করতাল যোগে জনপ্রিয় টুসুগান গাইতে গাইতে পদযাত্রীরা কলকাতা অভিমুখে এগিয়ে যান। ৬ই মে কলকাতা ময়দানে এক বিশাল জনসভা হয়। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ১৮৯৭ তে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন গান্ধিজীর আদর্শে বিশ্বাসী। ইতিপুর্বে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্বও প্রদান করেছিলেন।৮ টুসু সত্যাগ্রহ সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য ‘টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন’ প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন অরুণচন্দ্র ঘোষ। ধারাবাহিক

প্রতিবাদের অভিঘাতে বিব্রত হয়ে তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৬,৩রা মে দিল্লিতে যান ও ফিরে এসে বাংলা বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল করেন। অতঃপর ১৯৫৬, ১৬ই আগস্ট লোকসভার সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় ভূমি হস্তান্তর বিল। পুরুলিয়া সদরের ষোলটি থানা ও পূর্ণিয়ার কিছু অংশ ১লা নভেম্বর, ১৯৫৬ থেকে পশ্চিমবাংলায় অন্তভূক্তি হওয়ার কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৯] টুসু গান ও তার সাথে জুড়ে থাকা সামাজিক সত্যাগ্রহের ফলে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয়।

বাংলার লোকসংস্কৃতি, লোকগান বরাবরই সমাজের গভীর চিন্তা, অনুভব ও অসন্তোষের বাহক হয়ে এসেছে। টুসু গান তার অন্যতম নিদর্শন। এই ধরনের লোকগান জনগনের চেতনা নির্মানে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে তথা নিচুতলার মানুষের কন্ঠস্বর হয়ে ওঠে। ওপরে বর্নিত প্রতিবাদী ভাষা আন্দোলনের সময়েও টুসু গান গুলি প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে।, যার মাধ্যমে সাধারন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে। এই সংযোগ প্রমান করে লোকসংস্কৃতি শুধু আতীতের স্মৃতির আকার নয়, বরং তা এক জীবন্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্ত্রস্বরূপ। নিজের কথ্য ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা তথা নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতাকে গুরুত্বপ্রদান হেতু সংগঠিত টুসু সত্যাগ্রহ বঙ্গভূক্তির প্রাক্কালে এক গুরুত্বপূণ অধ্যায় ছিল, যা 'অমর একুশে' –র মতই এক মর্যাদাবান ইতিহাস। এটি কোন স্বাধীন দেশ গড়ার আন্দোলন ছিল না, ছিল কেবল বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার লড়াই ।[১০]

সহায়ক পঞ্জীঃ

১। মজুমদার, দি (সম্পা)। (১৯৫৬)। টুসুঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর। পৃ- ১২৩। কলকাতা।

২। সিংহ, শা।(২০০৪)। টুসু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র। প ব। পৃ – ৩৮৯

৩। মজুমদার, দি (সম্পা)। (১৯৫৬)। টুসুঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর। পৃ – ১০৫

৪। সিংহ, শা।(২০০৪)। টুসু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র। প ব। পৃ – ১৬৯- ১৭০

৫। জানা, দে(সম্পা)।(২০০৪)। অহল্যাভুমি পুরুলিইয়া। দ্বিতীয় পর্ব। দীপ প্রকাশণ। পৃ- ১১৩

৬। পুরুলিইয়া জেলা সংখ্যা। জুন ২০০৭। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পৃ- ১৯৭। প ব

৭। চৌধুরী, রা। (১৯৭৭)। ভাদু ও টুসু। ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পৃ ৬১, কলকাতা

৮। ঘোষ কে, আর ও হাজরা, এস।(২০০৫)। Manbhumer agnikanya Ma Labanyaprabha Ghosh, সাগর ইন্টারন্যাশানাল পাবলিকেশন। নদিয়া। পৃ- ৯

৯। পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা। জুন ২০০৭। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

১০। সরকার প্র। এক উপেক্ষিত ভাষা আন্দলন। আনন্দবাজার সম্পাদকীয়। ১লা ফেব্রুয়ারি,২০১৯।

Society Language Culture